হোমেন বরগোহাঞিঁর কথাসাহিত্য

বাসুদেব দাস

হোমেন বরগোহাঞি অসমিয়া সাহিত্যে একটি সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ১৯৩২ সনে অসমের লক্ষিমপুর জেলার ঢকুয়াখানা গ্রামে বরগোহাঞির জন্ম। শৈশব কেটেছে প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পিতার স্নেহচ্ছায়ায়। বরগোহাঞির লেখক জীবনের প্রথম প্রেম ছিল কবিতা। মাত্র তেরো বছর বয়সে মাধব বেজবরুয়া সম্পাদিত বাঁহী পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে বরগোহাঞির সাহিত্য জগতে আগমন। অসমিয়া সাহিত্যে প্রথম পদক্ষেপ কবি রূপে হলেও সাহিত্যর প্রায় প্রতিটি বিভাগেই বলিষ্ঠ পদচারণা বরগোহাঞির সৃষ্টিকে এক বিশেষ মাত্রা দান করেছে। আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় লেখকের উপন্যাস ও ছোটোগল্প।

১৯৬৩ সালে রচিত সুবালা বরগোহাঞির প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত একটি নিষ্পাপ, দুর্ভাগিনী, সুন্দরী যুবতি কিভাবে পতিতালয়ের পঙ্কিল জীবনকে গ্রহণ করতে বাধা হয়েছে, তারই সকরুণ কাহিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। হতাশাগ্রস্ত মায়ের আক্রোশ, ভোগবাদী ধনী সমাজের উগ্র ভোগলালসা এবং মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা নিরপরাধ মেয়েটিকে এই ভয়ানক জীবনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। কোনো কোনো সমালোচকের মতে উপন্যাসটিতে বিখ্যাত ইতালিয়ান ঔপন্যাসিক আলবোর্তা মোরাভিয়ার লা-রোমানো-র প্রভাব লক্ষ করা যায়। এ সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য তিনি শুধু মোরাভিয়া থেকে সাহসটুকু গ্রহণ করেছেন - 'বেশ্যাকে উপন্যাসের নায়িকা করার সাহস।' লেখকের ভাষায় সুবালা তাঁর 'অভিজ্ঞতা, তথ্যানুসন্ধান, ক্রোধ এবং করুণার ফসল।' উপন্যাসের চারটি পর্বে নায়িকা সুবালার সংঘাতময় জীবনের ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে। দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিষ্পেষিত সুবালার মা নিরুপায় হয়ে গ্রামের গুন্ডা আর লম্পট নরেনের হাতে মেয়েকে সঁপে দিয়ে বেশ্যাবৃত্তির দিকে তাকে ঠেলে দিয়েছে। সুবালা মায়ের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। আপাতত সহৃদয়া বলে প্রতীয়মান হওয়া এক অপরিচিত বৃদ্ধার হাত ধরে সে অপরিচিত জগতের বুকে, অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে পা রেখেছে। কিন্তু অচিরেই সে বৃদ্ধার আসল স্বরূপ আবিষ্কার করে বুঝতে পেরেছে যে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করা ছাড়া তার আর কোনো গতি নেই। এই অবস্থায় নরেন তাকে নিষ্ঠুরভাবে বলাৎকার করেছে। নরেন তার কৌমার্য হরণ করার পরেও সুবালা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। 'বেশ্যা হওয়ার চেয়ে আমি বরং আত্মহত্যা করব।' কিন্তু সে বেদনার সঙ্গে আবিষ্কার করেছে যে আত্মহত্যা করার মতো মানসিক সাহস তার নেই। তাই এ পথও সুবালার কাছে রুদ্ধ হয়ে গেছে।

তৃতীয় পর্বে সুবালা পুরোপুরি বেশ্যায় রূপান্তরিত হয়েছে। বেশ্যার দালাল কান্তি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। সুবালার ভেতরের চিরন্তন নারীসত্তা যেন এই প্রস্তাবে জেগে ওঠে। কান্তির গৃহিনী হয়ে সে চিরকালের জন্য বেশ্যালয় ছেড়ে চলে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু তার সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার আগেই কান্তির বিশ্বাসঘাতকতায় ভেঙে খানখান হয়ে যায়। প্রখর সমাজসচেতনতা, মানসিক মর্যাদা হারিয়ে যারা পঙ্কের আবিলতার মধ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে তাদের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও মানবিকতাবোধ উপন্যাসটিকে এক ভিন্ন মাত্রা দান করেছে। লেখক সুবালাকে এক সংবেদনশীল, মানবীয় মূল্যবোধগুলিকে আঁকড়ে থাকা সৎ হৃদয়ের নারী চরিত্র হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন। জীবনের মধুরতম, প্রাণ - প্রাচুর্য - সৌন্দর্যানুভূতিতে উত্তাল সময়টুকু পুরুষের কামনা, লালসাকে চরিতার্থ করে এসে যৌবনের প্রান্তবেলায় সুবালা ফিরে তাকিয়ে অতীতের ফেলে আসা দিনগুলির দিকে - 'বিকেলের অন্ধকারে নির্জন মাঠের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে কে যেন এখনও আমাকে সুরেলা স্বরে ডাকে, আর চারপাশের পাহাড়ে, নদীর জলে, নদীর পারে, বড়ো বড়ো গাছের গায়ে সেই আহ্বান ধাক্কা খেতে খেতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে...।'

বরগোহাঞির দ্বিতীয় উপন্যাস তান্ত্রিক (১৯৬৭) অন্তর জগতের উপলব্ধিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। মানুষের অন্তর্জগতের বৈচিত্র্যময় এবং রহস্যঘন রূপকে ফুটিয়ে তোলাই এর প্রধান উপজীব্য। অধ্যাপক অরুণ চক্রবর্তী সহকর্মী অমলের কাছে কনফেশন হিসেবে বলা কথাকুলির মধ্যেই উপন্যাসের মূল বক্তব্য ফুটে উঠেছে। মদের গ্লাস হাতে নিয়ে অমলের কাছে কনফেশন হিসেবে বলা কথাগুলির মধ্যেই উপন্যাসের মূল বক্তব্য ফুটে উঠেছে। মদের গ্লাস হাতে নিয়ে অমলের কাছে অরুণ একে একে তার জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা বলে গেছে। তাঁর মতে - 'মানুষের জীবন সত্যিই এক পরম রহস্যের ভান্ডার। কোন্‌দিন যে মানুষ তার সম্পূর্ণ রহস্য ভেদ করতে পারবে সে কথা আমার বিশ্বাস হয় না।' অরুণ চক্রবর্তী অহরহ অনুভব করে এক ভয়ানক রোগের যন্ত্রণা। জীবনের অসার, অর্থহীন আর ভয়ানক নিঃসঙ্গতা বোধ থেকে এই যন্ত্রণার উদ্ভব। আধুনিক জীবনের অস্তিত্ববাদী ধারণা থেকেই এই দৃষ্টিভঙ্গি উদ্ভূত।

কুশীলব (১৯৭০) উপন্যাসের বিষয়বস্তু রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার। গোপীনাথ মহন্তের মতো রাজনৈতিক নেতা নিজের রাজনৈতিক মুনাফার জন্য বীরু নামে এক শ্রেণির ভাড়াটে গুন্ডার সাহায্যে উচ্ছৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে। এইসব দেখে শুনেও রত্ন, সুন্দরাজনের মতো সংবাদসেবী বুদ্ধিজীবীরা চুপ করে থাকে। কারণ তাদের হাত পা কারও না কারও কাছে বাঁধা পড়ে আছে। তাই সুন্দরাজনের মতো বয়োবৃদ্ধ সংবাদিক ভাববিলাসী তরুণ সাংবাদিক রত্ন মজুমদারের কাছে স্বীকার করে - 'তোমার আমার মতো বুদ্ধিজীবীর দল আসলে অভিজাত সমাজের হারেম রক্ষাকারী নপুংসক খোজার দল।' রাজনৈতিক ভ্রষ্টারা উপন্যাসটির উপজীব্য হলেও আধুনিক জীবনের বিচ্ছিন্নতা বোধ থেকে উদ্ভূত করুণ দিকগুলিও উপন্যাসে ফুটে উঠেছে।

হালধীয়া চারায়ে বাওধান খায় (১৯৭৩) শীর্ষক উপন্যাসটি হোমেন বরগোহাঞির সামাজিক উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম। উপন্যাসের নায়ক রসেশ্বর সাতটি ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীকে নিয়ে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত। তার সম্বলের মধ্যে ছিল এক টুকরো চাষের জমি। একদিন সকালবেলা রসেশ্বর যখন মাঠে লাঙল চালাচ্ছে, তখন সেখানে আকস্মিকভাবে উপস্থিত হয় গ্রামের সবচেয়ে ধনী ঠিকাদার সনাতন শর্মা। সনাতনের মতো চতুর এবং ধুরন্ধর লোককে দেখে রসেশ্বর প্রমাদ গোণে। কারণ সনাতন শর্মা নিজের স্বার্থ ছাড়া কোথাও এক পা অগ্রসর হয় না। একটু পরেই রসেশ্বরের ভাবনার সত্যতা প্রমাণিত হয়। সে অবাক হয়ে শোনে এতদিন ধরে যে মাটির টুকরোটিকে সে বুক দিয়ে আগলে ধরে রেখেছে তার মালিক নাকি সনাতন শর্মা। রসেশ্বরের মৃত পিতার সরলতার সুযোগ নিয়ে ধূর্ত সনাতন শর্মা অনেকদিন আগেই জমি নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে রসেশ্বর আক্রোশে ফেটে পড়ে। তারপর শুরু হয় সেই চিরন্তন ইতিহাস। ধনীর রুদ্ধ দুয়ারে রসেশ্বর মাথা কুটে মরে। কিন্তু এত সহজে ভবী ভুলবার নয়। অন্য কোনো উপায় না দেখে রসেশ্বর মামলা করে। ডিম্বেশ্বর মন্ডলের কাছে মামলা সংক্রান্ত পরামর্শ চাইলে ডিম্বেশ্বর তবে মিথ্যা আশ্বাস দেয় আর ভেতরে ভেতরে রসেশ্বরকে সর্বস্বান্ত করার নতুন নতুন ফন্দি-ফিকির বের করে। এদিকে ওই দিন সকালেই সনাতন শর্মা তাকে নগদ একশত টাকা আর পাঁচ কেজি চিনি ভেট দিয়ে গেছে। শুধু কি ডিম্বেশ্বর মন্ডল? সনাতন বাপু, পিয়না, কেরানি, হাকিম থেকে শুরু করে সরকারি অফিসের প্রতিটি আমলাই দুর্নীতির দ্বারা আপাদমস্তক আবৃত হয়ে রয়েছে। উপন্যাসে রসেশ্বরের প্রচন্ড মানসিক নিপীড়নের ছবি ফুটে উঠেছে। -'টাকা, মদ, মেয়েমানুষ সংসারের কাছে ন্যায়বিচার পেতে হলে ক্ষমতার অধীশ্বরদের উপচারে পুজো দিয়ে সন্তুষ্ট করতে হবে। তার টাকা নেই, টাকা না হলে মদের যোগানও দেওয়া যাবে না, থাকার মধ্যে তার রয়েছে একটি মাত্র স্ত্রী। একটা চিন্তার তরঙ্গ খেলে যায়। আর কোনো উপায় যখন নেই, হাকিমের কাছে এক রাত্রির জন্য তার নিজের স্ত্রীকে তুলে দেবে না কি? জমিটাই যদি তাকে হারাতে হয়, তাহলে স্ত্রীকে রেখেই বা কি হবে?'

রসেশ্বরের চরিত্র চিত্রণে মনস্তাত্ত্বিক দক্ষতা আমাদের মুগ্ধ করে। শোষিতরা যে দিনের পর দিন মহাজন বা জমিদার দ্বারা নিপীড়িত হয়ে থাকে তার কারণও শোষিতদের অর্থনৈতিক দুর্বলতার মধ্যেই নিহিত। দিনের পর দিন নিগৃহীত হতে হতে তারাও যে সনাতনদের মতোই রক্তমাংসের মানুষ এই বোধটাই হারিয়ে ফেলে। আলোচ্য উপন্যাসের শেষেও আমরা দেখি রসেশ্বর খুবই সহজেই সনাতনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। যে সনাতন শর্মা তার সমস্ত পরিবারকে ধ্বংস করে দিয়েছে সেই সনাতনের হয়ে সে ইলেকশনের প্রচারে নেমেছে এর চেয়ে বড়ো ট্রাজেডি মানুষের জীবনে আর কি হতে পারে? রসেশ্বরের কাহিনি আমাদের সহজেই দুই বিঘা জমিনের উপেন এবং গোগোলের 'ওভারকোট' গল্পের আকাকি বাশমাচকিনের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। সামাজিক দুর্নীতির পটভূমিকায় এর কাহিনি গড়ে উঠলেও লেখক একে প্রচারধর্মী শ্লোগানে পরিণত করে তোলেননি। বরগোহাঞি দীর্ঘকাল চাকরি সূত্রে অসমের উচ্চ প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সরকারি আমলাতন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অপশাসনের যে বীজ গোটা শাসন ব্যবস্থাকে অন্যায় অবিচারের পীঠস্থান করে তুলেছে তা তিনি নিজের চোখে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তাই উপন্যাসের চরিত্রগুলিও এত জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

সৃষ্টিসন্ধান

পিতাপুত্র (১৯৭৫) উপন্যাসের জন্য হেমেন বরগোহাঞি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। বিংশ শতকের মধ্যভাগে অসমের পরিবর্তন - মুখর সমাজ জীবন আলোচ্য উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয়। উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব মুহূর্ত থেকে। কাহিনির পটভূমি পথঘাটের সুব্যবস্থা না থাকা অসমের অভ্যন্তরীণ একটি গ্রাম্য জীবন মহঘুলি নামে যে গ্রাম পরিচিত। মহঘুলি গ্রামের শিবনাথকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে।

উপন্যাসের প্রথম পর্বে শিবনাথের দিবাস্বপ্নের মাধ্যমে স্বাধীনোত্তর ভারতীয় তথা অসমিয়া সমাজ জীবনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তারপরে দ্বিতীয় পর্বে মহঘুলি গ্রামে নতুন দিনের জীবনধারা প্রচলনের কথা বলা হয়েছে। লোকাল বোর্ড স্বাধীনতার পরে নতুন করে রাস্তা বানিয়ে দিয়েছে। এই রাস্তা দিয়েই মহঘুলিতে এসেছে তথাকথিত নাগরিক সভ্যতা। মহঘুলিতে পেট্রোম্যাক্স জ্বলেছে। যুবকেরা লংপ্যান্ট পরে নতুন নাগরিক সভ্যতাকে স্বাগত জানিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এখানে সেখানে গড়ে উঠেছে ছোটো বড়ো চোরাই মদের দোকান। আগের কীর্তনঘোষা আর বরগীতের বিপরীতে মাইকে আর যুবকদের মুখে মুখে হিন্দি সিনেমার গান জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কেশব মণ্ডলের মতো লোকরা রাতারাতি ভোল পাল্টে গান্ধি টুপি পরে সমাজদারি হয়ে উঠেছে। বন্যাবিধ্বস্ত জনগণের জন্য সরকার পাঠানো রিলিফের আত্মসাৎ করে। কাহিনির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথ চরিত্র জটিলতর হয়ে উঠেছে। বড়োপুত্র গৌরীনাথকে নিয়ে শিবনাথের যে গর্ব ছিল আকস্মিকতার আঘাতে তা চুরমার হয়ে গেছে। একটি কৈবর্ত মেয়ের প্রেমে গৌরীনাথকে জড়িয়ে পড়তে দেখে শিবনাথের সামাজিক মর্যাদায় আঘাত লেগেছে। শুধু তাই নয় মেয়েটির পরিবারের লোকেরা সেই পুরোনো আমল থেকে শিবনাথের বাড়িতে পালা - পার্বণে ঘরামির কাজ করে এসেছে। শিবনাথের মতো মর্যাদা - সচেতন ব্যক্তির পক্ষে এরকম একটি পরিবারের মেয়েকে পুত্রবধূ করে ঘরে আনা কঠিন বইকি। তাই স্বাভাবিকভাবেই গৌরীনাথের সঙ্গে তার বিরোধ ঘনিয়ে উঠেছে। এদিকে বসন্ত রোগে মুখমন্ডল বিকৃত হয়ে যাওয়া বড়ো মেয়ে রম্ভা পরিবারের একটি সমস্যা। মহঘুলির কনক ঠিকাদার রম্ভাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। রম্ভার পক্ষে ছেলে পাওয়াটা নিঃসন্দেহে শিবনাথের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু এই প্রস্তাবে শিবনাথ খুশি না হয়ে ঠিকাদারের ওপর রাগে আগুন হয়ে ওঠে। এর পেছনেও রয়েছে শিবনাথের প্রচন্ড জাত্যভিমান। এককালে শিবনাথদের পরিবারের চাষবাসের কাজ করা লালুয়া বুড়োর ছেলে কনক আজ দুটো পয়সার মুখ দেখেছে বলেই শিবনাথের মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাবকে শিবনাথ বিনা দ্বিধায় ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে।

আলোচ্য উপন্যাসের সবচেয়ে আকর্ষক চরিত্র হল কেন্দ্রীয় চরিত্র শিবনাথ। একই সঙ্গে পুরোনো যুগের প্রতিভূ হয়েও নতুন এবং পুরোনো এই দুই যুগের সন্ধিক্ষণের সাক্ষী। বংশানুক্রমিকভাবে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী শিবনাথের সমস্ত গ্রামের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা রয়েছে। আর এই স্বতন্ত্রতার ওপর ভিত্তি করেই শিবনাথের অভিজাতসুলভ মানসিকতা গড়ে উঠেছে। এই মানসিকতা খুব সহজেই মানুষকে খেয়ালি আর দাম্ভিক করে তোলে। শিবনাথও তার ব্যতিক্রম নয়। উপন্যাসটিতে সমাজজীবনই যে মূল বিষয় তার ইঙ্গিত রয়েছে একেবারে শেষের বাক্যটিতে - 'এর পরের কাহিনি হবে বিংশ শতাব্দীর শেষ তিনটি দশকের ভারতবর্ষের ইতিহাস।'

কুশীলব উপন্যাসের মতো তিমিরতীর্থ (১৯৭৫) উপন্যাসেও বিষয়বস্তু রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার। আদর্শবান সাংবাদিক প্রহ্লাদকে বিভিন্ন সংঘাত এবং সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। স্বার্থপর, ভোগবাদী, রাজনৈতিক নেতার চক্রান্তে সমাজে সৃষ্ট হয় উচ্ছৃঙ্খলতা, গুন্ডারাজ আর ভ্রষ্টাচারের। এরকম একটি পরিস্থিতিতে প্রহ্লাদের মতো সাংবাদিকরা অন্তরে বাইরে সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়। নানা প্রলোভন এবং হুমকি সত্ত্বেও নিজের আদর্শে অটল হয়ে থাকার দৃঢ়তা লেখক প্রহ্লাদের চরিত্রে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। জীবনের যে সময়টিতে মানুষ সামাজিক মান-মর্যদা, ধনদৌলত, সুন্দরী স্ত্রী আর বিলাস-বৈভবের স্বপ্ন দেখে থাকে, প্রহ্লাদ তখন শুনতে পেয়েছিল এক অপরিচিত দুর্গম পথের আহ্বান। যুগে যুগে যে সমস্ত মানুষ পৃথিবীটা ভেঙেচুরে নতুন করে গড়ে তুলতে চায়, প্রথাগত জীবনের বাইরের গিয়ে জীবনের অর্থ খুঁজে বেড়ায় প্রহ্লাদ ছিল তাদেরই একজন। প্রতি মুহূর্তে সে জপ করে গ্যেটের মহামন্ত্র -'হে স্বর্গীয় শক্তি, যে মানুষ কখনও চোখের জল ফেলতে ফেলতে আহার করেনি বা বিষাদের রাতে উজাগরে থেকে নিজের বিছানা চোখের জলে সিক্ত করেনি, সে সমস্ত মানুষ তোমাকে কখনও লাভ করতে পারে না।' তবুও প্রহ্লাদ তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে রেহাই পায়নি। কারণ সে কোনো ভাববাদী জগতে বসবাস করে না। আর দশজন সাধারণ মানুষের মতোই সেও রক্তমাংসের মানুষ। প্রচণ্ড আর্থিক অনটন, প্রিয় সন্তান এবং প্রিয়তমার মুখে নিজের পছন্দ এবং ইচ্ছে অনুযায়ী সুখাদ্য তুলে দিতে না পারার বেদনা তাকে প্রতিটি মুহূর্ত জীবন্ত দগ্ধ করেছে। আর এখানেই চরিত্রটির স্বাভাবিকতা। লেখক তাকে কোনো মতেই বাস্তব সম্পর্কচ্যুত ভাবলোকের অধিবাসী করে তুলতে চাননি।

অস্তরাগ (১৯৮৬) ভাবপ্রধান উপন্যাস। বৃদ্ধ - মনস্তত্ত্বই হল উপন্যাসটির বিষয়বস্তু। এতে জীবনের এক করুণতম সত্য, বার্ধক্যের অসহনীয় যন্ত্রণার সঙ্গে সমাজ তথা মৌলিক মূল্যবোধের পরিবর্তনের এক করুণ চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শহরে বসবাস করা দিলীপ বৃদ্ধ রুগ্ন পিতাকে নিজের সঙ্গে রাখার জন্য গ্রাম থেকে নিয়ে আসে। ছেলের সঙ্গে থাকতে এসে শহরের মার্জিত সভ্যতার প্রলেপের অন্তরালে দিলীপের বৃদ্ধ পিতার যে আন্তরিক উপলব্ধি ঘটে তাঁরই মর্মস্পর্শী বর্ণনা উপন্যাসটিতে পাওয়া যায়। মানুষের অন্তরের যোগসূত্রের বিচ্ছিন্নতা আধুনিক মানুষের যন্ত্রণার অন্যতম কারণ। দিলীপের বৃদ্ধ পিতা তাই পুত্র - বউমা, নাতি - নাতনির সঙ্গে থেকেও গভীর নিঃসঙ্গতায় ভুগেছে। শহরে এসে তিনি একটা কথা প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করেছেন - 'বার্ধক্য যেন আধুনিক মানুষের চোখে একটা অপরাধ।' এই মারাত্মক উপলব্ধি দিলীপের বাবাকে শেষের দিকে নানা ধরনের রোগে আক্রমণ করেছে। 'সেনাইল ডিমেনশিয়া' রোগে আক্রান্ত হয়ে অন্যত অনেকের মতো তারও স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে। এই পরিণতি প্রতিটি মানুষের জীবনের এক করুণ সত্য। আলোচ্য উপন্যাসে লেখক পাশ্চাত্যের অস্তিত্ববাদী দর্শন এবং মনঃসমীক্ষণের মাধ্যমে জীবনের এক পরম সত্যকে উন্মোচনের প্রয়াস করেছেন।

১৯৮৭ সালে রচিত হেমেন বরগোহাঞির সাউদর পুতেকে নাও মেলি যারর উপন্যাসটি শিশু মনস্তত্ত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। অজ্ঞানতা ও অন্ধকারে ঘেরা এক গ্রামের একটি অবোধ শিশুর নাগরিক জীবনে প্রবেশ লাভ এবং ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শে এসে এক নতুন আনন্দময় জগতের সন্ধান অত্যন্ত মনোরম ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। বিক্রম ওরফে বাপুকণ এর মুখ্য চরিত্র, বাপুকণের বন্ধু হেবাঙ। গ্রামের কোথাও আম জাম পাকলেই বাপুকণ আর হেবাঙ সেখানে হাজির হয়। হেবাঙ সঙ্গে করে কাটারি (এক রকমের ছোটো দা), লবণ আর লঙ্কা নিয়ে আসে। কলাপাতায় কচি আম কুচি কুচি করে কেটে লবণ আর লঙ্কা মিলিয়ে খাবার যে স্বাদ তা কেবল এদের বয়সের ছেলেমেয়েরাই জানে। নির্জন ভূতুড়ে বাড়ি হলিবারির গাছগুলিও এদের দৌরাত্ম্য থেকে রক্ষা পায় না। আষাঢ় মাসের ভর দুপুর, সমস্ত পৃথিবীর জনপ্রাণীর মাঝে বিরাজ করছে এক অপূর্ব নিস্তব্ধতা, এমনকি অরণ্যের গাছগুলিও যেন একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। এই সময়ে কি ঘরে বসে অঙ্কের খাতায় মুখ বুজে বসে থাকতে ভালো লাহে? তাই বাপুকণও দুই বন্ধু মিলে সাঁতার কাটতে বেরিয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক কোলে বড়ো হয়ে ওঠা এই দুই বালকের নিত্য নতুন দুষ্টমিতে ভরা জীবন আমাদের শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। মনে হয় কোথায় যে এদের মধ্যে সুগভীর মিল রয়েছে। লেখকের অত্যন্ত প্রিয় বিষয় মৃত্যুচেতনা এবং প্রকৃতির প্রতি নিবিড় ভালোবাসা উপন্যাসটিকে বিশেষত্ব দান করেছে। প্রকৃতির বুকে বিচরণ করতে গিয়েই বাপুকণরূপী বরগোহাঞি আবিষ্কার করেছে - 'এই পৃথিবী কি অপরূপ সুন্দর, এর প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতিটি আলোর কণা, প্রতিটি পশুপাখি, প্রতিটি মানুষ আশ্চর্য অসামান্যরূপে সুন্দর।' বাপুকণের পিতা কোমল ও কঠোরের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। পিতার কোলে মাথা রেখে বাপুকণ রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে গল্প শোনে। রাতের রহস্যময় বিশাল আকাশ, অজস্র প্রদীপের মতো জ্বলতে থাকা আকাশ ভর্তি তারা, শুক্লপক্ষের মনোহর চাঁদ বাপুকণের মনে নানা ধরনের জিজ্ঞাসার জন্ম দেয়। বাপুকণের মন উড়ে চলে কোটি কোটি অর্বুদ বছর অতীতে - যখন গ্রহ - নক্ষত্র - সূর্য এবং পৃথিবী কিছুই ছিল না - ছিল মাত্র অন্তহীন শূন্য। কিন্তু একটা কথা সে কিছুতেই বুঝতে পারে না, যে কোনো বস্তুই - আদি না থাক কীভাবে সম্ভব? যদি এই সকল বস্তুরই একটা আদি ছিল, তাহলে সেই আদির আগে কী ছিল? তারও আদিতে? বুপুকণের জীবনে পরম এবং চিরন্তন বিস্ময়ের সেটিই প্রথম অভিজ্ঞতা। উপন্যাসটিতে লেখক কিছু অসাধারণ মুহূর্ত আমাদের উপহার দিয়েছেন। এর মধ্যে অন্যতম মাখনীর মৃত্যুদৃশ্য। মাখনী তার রোগজীর্ণ ছোট্ট জীবনটির সমস্ত স্নেহসুধা এবং ব্যাকুলতা ঢেলে একবার মাত্র ডেকে উঠল - দাদা। তার পরমুহূর্তে সে বাপুকরণের হাতটা মুঠো করে ধরে ঘুমিয়ে পড়ল। এখানে লেখক যে অপূর্ব সংযমের পরিচয় দিয়েছেন তা আমাদের পথের পাঁচালি -র মৃত্যুদৃশ্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। 'আকাশের নীল আস্তরণ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে অনন্তের হাতছানি আসে - পৃথিবীর বুক থেকে ছেলেমেয়েরা চঞ্চল প্রাণের বেলায় জীবনের সেই সর্বাপেক্ষা বড় অজানার ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছে।' রেণুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে বাপুকণের অন্তরে জেগেছে প্রেম। এই কিশোর - প্রেমে কোনো ধরনের মলিনতা নেই। রেণুর আবির্ভাব বাপুকণের চোখের সামনে নিয়ে এসেছে রামধনুর সাত রঙের বৈচিত্র্য। একদিকে রেণুর প্রতি তীব্র আকর্ষণ অন্যদিকে আদর্শ সৎ মানুষ হওয়ার জন্য ব্রহ্মচর্য পালনের আকাঙ্ক্ষ - এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে বাপুকণের কিশোর কোমল প্রাম রক্তাক্ত হয়েছে।

মৎস্যগন্ধা (১৯৬৭) উপন্যাস আকারে ক্ষুদ্র হলেও বরগোহাঞির প্রতিভার বৈচিত্র্যের স্বাক্ষর হিসাবে শুধু নয় অসমিয়া উপন্যাস সমাজবাস্তবতার উজ্জ্বলতম নিদর্শন

সৃষ্টিসন্ধান

হিসেবেও বইটির গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের সমাজে প্রচলিত জাতিভেদের সমস্যাকে কেন্দ্র করে কাহিনি গড়ে উঠেছে। রোমান্টিক আবেগের বশে এর কাহিনিকে লেখক কোথাও আদর্শায়িত করে তোলেননি। অসমের সুদূর গ্রামেগঞ্জে এখনও জাতিভেদ রূপ কুৎসিত ব্যাধি বর্তমান লেখক তাররই ছবি নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মেনকা সুযোগ এসে গেল এক আশ্চর্য উপায়ে। মেনকার ননদ কমলা মহঘুলি গ্রামের মণিরামের সঙ্গে অবৈধ মিলনে গর্ভবতী হয়। লোকলজ্জার ভয়ে কমলা আত্মঘাতী হতে চাইলে মেনকা তাকে সাহস জোগায়। উপসংহারে আমরা দেখি মেনকার মধ্যস্থতায় কমলার সঙ্গে মণিরামের বিয়ে হয়। এখানেই শেষ নয়। আত্মীয়স্বজন ছেড়ে মণিরাম ডোমগ্রামের দিগম্বরের ঘরজামাই হয়। মেনকার বহুদিনের প্রতিশোধস্পৃহা এভাবেই চরিতার্থলা লাভ করে। ভাষার বলিষ্ঠতার সঙ্গে ধ্বনিমাধুর্য ও কল্পচিত্র যুক্ত হওয়ায় উপন্যাসটি একটি বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে।

বরগোহাঞির উপন্যাসে প্রকৃতি এক বিরাট অংশ অধিকার করে রেখেছে। তাঁর উপন্যাসে প্রকৃতির এই বিশেষ স্থান লাভের কথা স্বীকার করে নিয়ে লেখক বলেছেন- 'আমার নিজের জীবনে গভীরতম আনন্দ বেদনার একটি প্রধান উৎস হল বিচিত্র রহস্যময়ী প্রকৃতি। আমার নিজের লেখার বেশ কিছুটা অংশ দখল করে রয়েছে প্রকৃতির বর্ণনা। তাই একথা মোটেই আশ্চর্যের নয় যে জীবনের রূপে চিত্রিত নিসর্গ দৃশ্য আমার মনে বিচিত্র আবেগের আলোড়ন তুলেছিল। প্রকৃতি থেকেই আমি আহরণ করেছি জীবনের সঞ্জীবনী সুধা।' পিতা - পুত্র, অস্তরাগ এবং সাউদর পুতেকে নাও মিলে যায় উপন্যাসে বরগোহাঞি গভীর প্রকৃতি প্রীতি এবং প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনের অনির্বচনীয় আবেগানুভূতির হিল্লোল অনুভব করা যায়।

উপন্যাসের মতো ছোটো গল্পেও বরগোহাঞির দক্ষতা অনস্বীকার্য। রামধেনু যুগে তাঁর গল্প সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। পূর্বদেশ পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন - 'মাত্র আধা ডজন গল্প লিখেই আমি সবার মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। খুব সম্ভব তার প্রধান কারণ হলো এই যে মধ্যবিত্ত অসমিয়া লেখক যে সব পরিচিত এবং নিরাপদ পথে বিচরণ করে তার থেকে কিছুটা দূরে সরে গিয়ে আমি কয়েকটি নিষিদ্ধ অন্ধকার গলিতে প্রবেশ করেছিলাম এবং তার থেকে কুড়িয়ে এনেছিলাম বেশ্যা, গুন্ডা, খুনী, অপরাধী, আর মানসিক রোগীর মতো কিছু ব্রাত্য চরিত্র।' আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের দুটি কেন্দ্রবিন্দু হল ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব এবং মার্ক্সবাদ। হেমেন বরগোহাঞি তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এই দুই মহান লেখকের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম জীবনের রচনায় বিশেষ করে ফ্রয়েডের প্রভাব অনুভূতি হয়।

'অক্টোপাস' বরগোহাঞির একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। চরিত্র - প্রধান গল্পটিতে অপরাধ প্রবণতার নির্মোহ ছবি অঙ্কিত হয়েছে। নিগ্রো সৈনিক বব ওরফে রবার্ট ছিল যুদ্ধের সময়ে অসমে এসেছিল। কোনো এক অপরাধের জন্য তার চাকরি যায়। তারপর পুনরায় অসামরি অপরাধে লিপ্ত হয়ে সাত বছরের জন্য জেল হাজতে বাস করে। সে জেল থেকে বেরিয়ে দেখে যে যুদ্ধ কবেই শেষ হয়ে গেছে। দেশে ফিরে না গিয়ে সে ডিবুগড়েই থেকে যায়। মোটর গাড়ির এক কারখানায় সে মেকানিকের কাজ নেয়। তার বেশিরভাগ বন্ধুই খুনি, ডাকাত আর মদ্যপ। একদিন বব একজন প্রৌঢ়া দেহোপজীবিনীকে খুন করে। খুনের কারণ সম্পর্কে সে তার বন্ধু গৌতমকে বলে মেয়েটিকে সে ভালোবাসত। বেশ্যার জীবনে যৌবনই একমাত্র সম্বল। তাই বুড়ি হয়ে আসা মেয়েটিকে খুন করে সে তার ভবিষ্যতের অন্ধকারময় জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছে। জুডি নামে এক কুলি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে উপলক্ষে বব বন্ধুদের ডেকে এনে একদিন হোটেলে পার্টি দেয়। বিয়ের তিনমাস পরেই জুডি ভিক্টরের সঙ্গে প্রেমের খেলা শুরু করে। বব সমস্ত কথা গৌতমকে জানিয়ে তাকে সেদিন রাত দশটায় দেখা করতে বলে। গৌতম গিয়ে দেখতে পায় জুডিকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে বব পুলিশের জন্য অপেক্ষা করছে। ববের নীরব কিন্তু বাঙ্ময় মুখমন্ডলে জীবনের যে রহস্যময় নাটকের অভিনয় চলছিল তা দেখে গৌতম স্তব্ধ হয়ে যায়। ববের মানসিক সংগঠনে নানা শক্তি খেলা করেছে। ঈর্ষা, স্যাডিজম, জীবনের প্রতি আকর্ষণ, অপরাধপ্রবণতার সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে ববের মানসিক জগৎ।

'আবেলির আলিবটর গল্প' বরগোহাঞির প্রথম প্রকাশিত গল্প। ১৯৫২ সনে্ কটন কলেজের ম্যাগাজিন কটনিয়ান -এ গল্পটি প্রকাশিত হওয়ার পরেই ভবানন্দ দত্তের মতো তীক্ষ্ণধী অধ্যাপক সমালোচক তরুণ বরগোহাঞির প্রতি আকৃষ্ট হন। গল্পটিতে প্রকাশিত বিষয়বস্তু অভিনবত্ব পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গল্পের কথক শহরের এক কোণে অবস্থিত সস্তার চা দোকান একটিতে বসে কোলাহল পরিপূর্ণ বিকেলের রাস্তার দিকে তাকিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেয়। চায়ের দোকানটির নামও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ - 'কাফে ইন্টার নেশনেল'। তাঁর দৃষ্টির পরিধিতে আসা শহুরে জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলি তংকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। মোটর গাড়ির ঘর্ঘর আওয়াজ, ভাজা চিনাবাদামের পটপট শব্দ, রাস্তার পাশে অবস্থিত সিনেমা হলে টিকিট না পাওয়া মানুষের বিকট চিৎকার ইত্যাদি তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সিনেমার পোস্টারে একজন সুন্দরী অভিনেত্রীর করুণ মুখ দেখেও সে বিহ্বল হয়ে পড়ে। রাস্তায় পরিচিত অপরিচিত বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে একজন বুড়ো চিনা মিস্ত্রিও রয়েছে। মহাযুদ্ধের সময় মিলিটারি সৈনিকের দ্বারা ধর্ষিতা হয়ে সমাজের আবর্জনায় পরিণত হওয়া একজন অসমিয়া মহিলাকে সে বিয়ে করেছিল। সে মেয়েটিকে আশ্রয় আর মর্যাদা দান করেছিল। কিন্তু বুড়ো হয়ে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলায় মহিলাটিকে দেহোপজীবিনী হতে বাধ্য করে। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে একটি পাগলিনি ভিখারিনিও রয়েছে। তার দুঃখ গত তিন দিন ধরে সে চা খেতে পায়নি, কারণ ডাস্টবিনে ভাত পাওয়া গেলেও চা পাওয়া যায় না। আপপাত দৃষ্টিতে বিক্ষিপ্ত বলে মনে হলেও গল্পটিতে একটি সুদূর ঐক্য রয়েছে। এই সূত্র হল লেখকের অন্তরঙ্গ জীবনে আলোড়নের সৃষ্টি করা শহরের একটি অংশ - যেখানে সমস্ত পৃথিবীর বিচিত্র অভিজ্ঞতা উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে। শহরের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত মনোভাব গল্পের কেন্দ্রে ক্রিয়াশীল।

১৯৬৬ সনে প্রকাশিত 'বিভিন্ন নরক' লেখকের সর্বভারতীয় স্বীকৃতি প্রাপ্ত গল্প সংকলন। সংকলনের অন্তর্ভুক্ত 'চোর' গল্পে লেখক দারিদ্র্যের ভয়াবহ ছবি অঙ্কন করেছেন। এরকম তীব্র বাস্তবতাবোধ অসমিয়া সাহিত্যে বিরল। গল্পটিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির একজন লোক কাজ করার লোকের খোঁজ করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এমনই সময়ে একদিন গঙ্গু নামের একটি চৌদ্দ - পনেরো বছরের ছেলে এসে উপস্থিত হল। তার কাজের প্রয়োজন। ঘর কোথায় জিজ্ঞেস করলে সে বলল তার ঘন নেই। যাই হোক গৃহস্বামী তাকে কাজের জন্য রেখে দেয়। দুই একদিনের মধ্যেই দেখা গেল ছেলেটি চুরি করছে। হারানো জিনিসগুলির মধ্যে ছিল পাউরুটি, ব্লাউজ, ছোটো মেয়েদের ফ্রক ইত্যাদি। ছেলেটির বালিশের নিচে একদিন মালকিনের একটা নতুন চাদর পাওয়া গেল। একদিন রাত বারোটার সময় গৃহস্বামী ছেলেটিকে চুপিসাড়ে অনুসরণ করে দেখতে পেল শতচ্ছিন্ন মলিন কাপড়ে চাল এবং বস্তার বেড়ার আড়ালে একজন দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত মহিলা আর তার পাশেই একটি ছোট্ট মেয়ে - নিশ্চয় ছেলেটির মা আর ছোটো বোন। দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্তা মায়ের কথা শুনলে কেউ তাকে চাকরি দেবে না ভেবে সে পরিচয় লুকিয়েছিল। চুরি করে আনা এক বাটি ভাত দৌড়ে পালানোর সময় বালিতে পড়ে যায়। লেখক সবিস্ময়ে দেখেন বালিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা ভাতগুলি সে কুড়িয়ে নিতে থাকে। লেখকের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ও হাহাকার করে ওঠে।

'ইসমাইল শেখর সন্ধানত' বরগোহাঞির একটি বিখ্যাত গল্প। রিকসাচালক অন্নদাচরণ মুখোপাধ্যায়ের দুর্ভাগ্যপীড়িত দেহোপজীবিনী মেয়েটির জীবনকাহিনি যেমনই অপূর্ব তেমনই মর্মন্তুদ। দেশ বিভাগের পরে, পূজা - আহ্নিকে ব্যস্ত মুখোপাধ্যায় অন্য অনেকের সঙ্গে জন্মভূমি পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে উদ্বাস্তু হয়ে কোনো উপায় না পেয়ে রিকশা চালাতে শুরু করে। তাঁর শিক্ষিতা মেয়ে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে। তবে অবসর সময়ে সে মোরাভিয়ার উপন্যাস পড়ে। গীতা ছিল তার কণ্ঠস্থ। এক ধাক্কায় ব্রাহ্মণের পুজোর ঘর থেকে এসে সে উপস্থিত হয়েছে বেশ্যার রতিকক্ষে। গণিকা হওয়া সত্ত্বেও সে নিজেকে কখনও হীন ভাবেনি। তার আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল অত্যন্ত প্রখর। কোনো কোনো সমালোচক আলোচ্য গল্পে মার্ক্সীয় দর্শনের প্রভাব রয়েছে বলে মনে করে থাকেন। বরগোহাঞির বেশ কিছু গল্প অসমের ক্ষুদ্র ভৌগোলিক গন্ডি অতিক্রম করে ভারতীয় তথা বিশ্ব সাহিত্যের আঙিনায় স্থান লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছে। শুধু বিষয়বস্তুর দিক দিয়েই নয়, আঙ্গিকগত পরীক্ষা - নিরীক্ষার দিক দিয়েও হেমেন বরগোহাঞির গল্প অসমিয়া সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্টতার দাবি রাখতে পারে।

সৃষ্টিসন্ধান